দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৪ ৭

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

গত শনিবারে এসএসসি এবং সমমানের মাদ্রাসা ও কারিগরি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। পরীক্ষায় পাসের গড় হার ৫২ দশমিক ৫৭। গত বৎসরের পাসের হার ছিল ৫০ দশমিক ২৭ এবং তৎপূর্ববর্তী বৎসরে পাস করিয়াছিল ৩৬ দশমিক ৮১ ভাগ। দেখা যাইতেছে পরীক্ষার ফলাফল ক্রমান্বয়ে ভাল হইতেছে। ইহা নিঃসন্দেহে আশা-ভরসার দিক। এসএসসি, মাদ্রাসার দাখিল ও কারিগরি পরীক্ষায় এই বৎসর সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী জিপিএ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেশ) নম্বর লাভ করিয়াছে। এবারে জিপিএ নম্বর প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হইতেছে ১৭,২৭৬ জন। গত বৎসর জিপিএ নম্বর পাইয়াছিল ৯,৮৮৬ জন পরীক্ষার্থী এবং তৎপূর্ব বৎসরে জিপিএ নম্বর পাইয়াছিল ১৩৯২ জন পরীক্ষার্থী। দেখা যাইতেছে পরীক্ষার ফলাফল ক্রমশ ভাল হইতেছে। ইহা নিঃসন্দেহে আশা-ভরসার জানান দিতেছে। এবার সারাদেশে পাসের হার ৫২ দশমিক ৫৭। ৭টি বোর্ডের মধ্যে সবচাইতে ভাল ফল করিয়াছে যশোর বোর্ড। তাহাদের পাসের হার ৬৯ দশমিক ১৯। সবচাইতে খারাপ ফল করিয়াছে রাজশাহী। এই বোর্ডে পাসের হার হইতেছে ৪৩ দশমিক ১৩ ভাগ। চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬০ দশমিক ৯২, কুমিল্লায় ৫৫ দশমিক ৮৯ এবং ঢাকায় ৫২ দশমিক ৮৫ ভাগ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। শতকরা ৫০ ভাগের নীচে পাস করিয়াছে সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা। গড় পাস ৫২ শতাংশের বেশী। দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার ৬২ দশমিক ০৫ ভাগ। ঢাকা বোর্ডে দশটি স্কুলের সকল পরীক্ষার্থী পাস করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। এই দশটি স্কুলের প্রতি আমাদের অভিনন্দন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সাফল্যের বিপরীতে দেখা যায় ৪০১টি স্কুল-মাদ্রাসায় কেউ পাস করিতে সমর্থ হয় নাই। এই বৎসর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৩৯ জন। ইহার মধ্যে পাস করিয়াছে ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯ শত ৯৩ জন। পাসের হার বিবেচনায় নিলে এই বৎসর ঢাকা, যশোর ও চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে কুমিল্লা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেটে গত বৎসরের তুলনায় পাসের হার হ্রাস পাইয়াছে। এই বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

৪০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে কেউ পাস দিতে পারে নাই। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবগুলির অবস্থান মফস্বলে। ফেল করিয়াছে বা টানিয়া-টুনিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এমন ছেলে-মেয়ের সংখ্যা পল্লী এলাকায় সর্বাধিক। শহরাঞ্চলেও অনেকে খারাপ ফল করিয়াছে। তবে সংখ্যা তুলনায় কম। স্বীকার্য যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার্থীদের বেশীর ভাগই দরিদ্র ঘরের সন্তান। অভিভাকদের অধিকাংশ নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার খরচপাতি যোগাইবার মত অবস্থা সকলের নাই। শহরাঞ্চলের মত কোচিং-এর সুযোগ-সুবিধা গ্রামাঞ্চলে তেমন নাই। এমত অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা শহরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কিভাবে? এই বাস্তবতা মানিয়া নিয়াও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, শুধু কি এই কারণেই গ্রামের ছেলে-মেয়েরা গণ্ডায় গণ্ডায় ফেল করে? গ্রামের স্কুল-মাদ্রাসারও এখন অনেক উন্নতি হইয়াছে। মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়াছে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ হইয়াছে। বেসরকারী স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষকগণ মূল বেতনের নব্বই শতাংশ পাইয়া থাকেন সরকারী কোষাগার হইতে। পল্লী এলাকার নারী শিক্ষা এখন কেবল বিনা বেতনে নহে, তাহাদের খাতা-বই সব ফ্রি এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে বৃত্তির ব্যবস্থা। মেয়েদের স্কুল বেতনের পুরাটাই সরকার পরিশোধ করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর শিক্ষা খাতে বিপুল অংকের অর্থ বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষা খাতের বরাদ্দ বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষা খাতের বিপুল অর্থ ব্যয়ের অধিকাংশ যায় শিক্ষকদের বেতন বাবদ। ইহার পরও স্কুলের সব পরীক্ষার্থী ফেল করিবে, ইহা কোন্ কথা? এই ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই ক্ষেত্রে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সর্বাগ্রে শিক্ষকদেরই যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা প্রয়োজন। অনেক উন্নত দেশে শিক্ষকদের রিফ্রেসার্স কোর্সের ব্যবস্থা আছে।

স্কুলের শিক্ষা প্রয়োজন মাফিক হইলে স্কুলের সব ছাত্র ফেল করার কথা নয়। এখন অনেকে বলেন যে, শিক্ষকদেরই যোগ্য করিয়া তোলার জন্য প্রশিক্ষণ আবশ্যক। শিক্ষকরা যাহাতে ভালোভাবে পড়াইতে পারেন তাহার যাবতীয় ব্যবস্থাই প্রথমে নেওয়া আবশ্যক। পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের দায়িত্ব কেবল ছাত্রের নয়, শিক্ষক, অভিভাবক সকলকেই এই দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের মতে দশ ভাগ ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করিতে পারে। কিন্তু শতকরা একশত জন ফেল করার কথা নয়। যে ক্ষেত্রে শতভাগ ফেল করে, তাহার নিশ্চয়ই কোন কারণ রহিয়াছে। এখন তাহাই সন্ধান করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হইবে।